উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যা : আধুনিকতার এক সমুজ্জ্বল প্রতিফলন

ড: নিবেদিতা পাল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
ইতিহাস বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন
দুরাভাষ- ৯৮৩০৫১৫৬২৪

উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যা ঃ আধুনিকতার এক সমুজ্জ্বল প্রতিফলন ।

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর সম্মান ও অধিকারের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। সমাজ পুরুষকে দিয়েছিল অবাধ অধিকার, কিন্তু নারীকে সবরকম অধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। বৃহত্তর সামাজিক আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে নারীর জীবন শুধু গৃহবন্দী হয়ে পড়ে। (১) উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ দেখা দেয় এবং সমাজের অর্ধাংশের বিষয় ভাবনা শুরু হয়। জীবিকার জন্য নারী শতাব্দীর পর শতাব্দী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে। বাল্য বিবাহ নিবারণ, বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। সূতিকাগৃহে নারীর বেদনা প্রশমিত করা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর অংশগ্রহণ ও মহিলা চিকিৎসক হিসেবে বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ নারীর আধুনিকতা ও আত্মসম্মান লাভের সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

প্রত্যেক সংসারে রোগ ও অসুস্থতা নিত্যকার বিষয়। রোগী পরিচর্যা সম্বন্ধে নারী পুরুষ উভয়ের দায়িত্বের কথা বলা হলেও সমাজ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা উচিত বলে মনে করত। 'কারণ রমণী স্বভাবতঃ দয়াবতী ও মধুভাষিণী। তাঁহাদের কোমল হস্তের শুশ্রূষায় রোগী যেমন আরাম পায়, পুরুষের স্বভাব কঠোর হস্তে তাহা সম্ভবপর নহে। (২) এই স্বাভাবিক গুণের জন্য শুশ্রূষাকার্য নারীদের দ্বারা সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নারীর অসুস্থতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত না। কন্যা শিশুর জন্ম ছিল পরিবারের কাছে অপ্রার্থিত বা অবাঞ্ছিত। প্রসূতির সময় নারীকে সূতিকাগৃহে অনেকরকম কষ্ট সহ্য করতে হত। এই প্রসঙ্গে Daily Graphic এর প্রতিনিধি Mary Frances Billington মনে করেছিলেন — ' In an Indian house, the women's quarters known as zenana or in colloquial Hindustani as bibighar are always architecturally and artistically its meanest part. Not only the women of the household, but friends and relations from far and wide would visit the mother crowding into the close room which is often kept at such a degree of heat that existence might be well-nigh unendurable. Observances are regarded not merely as sanitary, but as religious obligations." (৩)

ব্রিটিশ শাসকগণ ঔপনিবেশিক প্রজাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন না। তাসত্ত্বেও ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই নির্মাণ করেছিল। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিস্তারের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা। রাধিকা রামাসুব্বান মনে করেন যে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমিত ছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য যৌনরোগে আক্রান্ত হলে সরকার তাদের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হয় কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল স্তম্ভ ছিল সেনাবাহিনী। ইউরোপীয় সেনাদের পরিবার তাদের সাথে ভারতে না থাকায় অনেক ইউরোপীয় সেনাগণ পতিতা পল্লীতে যাতায়াত করত এবং তারা যৌনরোগে আক্রান্ত হত। তাই সাম্রাজ্যের সামরিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় পতিতা মহিলাদের চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রথম অগ্রসর হয়েছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সামরিক ছাউনিতে বা cantonment areas এ 'lock hospital' ব্যবস্থা শুরু করা হয় পতিতাদের যৌনরোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। লন্ডনে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এই নামে হাসপাতাল প্রচলিত ছিল। "In the nineteenth century it was accepted that veneral diseased patients would be locked up until they were cured and it was invariably understood that these patients would be women prostitutes. Women found to be disordered on customary days of inspection were to be sent at once to the hospital." (৪) সেনাবাহিনীর ছাউনির কাছাকাছি 'লালবাজার' বা যৌনপল্লী থাকত। লালবাজারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে যে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা থাকত, তার কর্তব্য ছিল পতিতাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি

দেওয়া এবং যৌনরোগে আক্রান্ত পতিতাদের বহিষ্কৃত করা বা লক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা। সরকার বেরহামপুর, কানপুর, ফতেগড়, আগ্রা প্রভৃতি জায়গায় diseased public women দের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করে। সরকার ইউরোপীয় সেনাদের ভারতে পরিবার রক্ষার জন্য অধিক অর্থ খরচে অনিচ্ছুক ছিল। তাই ভারতীয় পতিতাদের সাথে ইউরোপীয় সৈন্যদের যৌন সম্পর্ককে তারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছিল। ১৮৬৮ সালের Indian Contagious Disease Act দ্বারা পতিতাদের নাম নথিভুক্ত করা, নিয়মিত ব্যবধানে পতিতাদের শারীরিক পরীক্ষা করা এবং বাধ্যতামূলক চিকিৎসা করানোর কথা বলা হয়েছিল। ফলে এই 'লক হাসপাতালে' ব্রিটিশের খাতায় নথিভুক্ত বেশ্যা মহিলারা প্রথম পশ্চিমি চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা। "The Colonial establishment took it up as a part of its imperial credo, and the missionaries incorporated it into their evangelizing project while the critics of empire identified western medicine not with liberation and well being but with subjugation and slavery." (৫) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পুরুষ শাসিত শাসনব্যবস্থায় ঔষধ এবং স্বাস্থ্য ছিল পুরুষকেন্দ্রিক এবং মহিলারা পুরুষের স্বাস্থ্যের সাথে সংযুক্ত বস্তু বা "appendages to the health of man" বলে পরিগণিত হত। একই সময়ে ইংল্যান্ডের মহিলারা ধাত্রীদের দ্বারা সন্তান প্রসবের সুবিধা লাভ করতেন এবং চিকিৎসাবৃত্তি ধাত্রীবিদ্যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর্যায় উন্নীত করেছিল। ১৮৩৩ সাল থেকে প্রসূতি ও নারীর শরীর সংক্রান্ত "Books of Advice" প্রকাশিত হতে থাকে। নারীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার প্রগতি ঘটে যখন ১৮৪৭ সালে 'ক্লোরোফর্ম' আবিস্কৃত হয় যা প্রসবের বেদনাকে অনেকাংশে লাঘব করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতের প্রথাগত প্রসূতি প্রথা এবং মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ধারণা সমালোচিত হতে থাকে। সূতিকা গৃহে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় সন্তান প্রসব হয় এবং মাকে অবজ্ঞার সাথে ফেলে রাখা হয়। আঁতুড়ঘরের অবস্থার জন্যই মাতা এবং শিশুর মৃত্যুর হার ভারতে অনেক বেশী পরিমাণে দেখা যায়। ধাইয়ের সাহায্যে শিশু প্রসব করানো ছিল প্রসূতির প্রথা। ধাই বৃত্তিতে যুক্ত রমণীরা ছিল নীচু জাতের হিন্দু বা গরীব মুসলমান মহিলাগণ। বাংলায় হাদি বা ডোম, উত্তর ভারতে চামার বা মেথরানি এবং দক্ষিণে নাপিত জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল ধাই মহিলারা, এবং তাদের মধ্যে পেশাদারিত্বের অভাব লক্ষণীয়। স্বল্প অর্থের বিনিময়ে ধাই সন্তান প্রসব ও আঁতুড়ঘরে মা ও সন্তানকে দেখাশোনা করত। কিন্তু অশিক্ষা ও অজ্ঞতার ফলে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য বিপদগ্রস্ত হত। পরিস্কার, পরিচ্ছন্নতা তার কাছে অজানা ছিল।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক প্রজাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আগ্রহী ছিলনা, অপরদিকে ব্রিটিশ বা ভারতীয় পুরুষগণ জন্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিরুৎসাহ ছিল। প্রথমে মিশনারী মহিলারাই এই প্রসূতি প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। বালফোর এবং ইয়ং বলেছেন যে "The stimulus for the first dhai training schemes was provided by those missionaries who had gained access beyond the purdah as teachers and were grieved to see their young pupils dying in child birth." (৬) জেনানা মহল ছিল তাদের দৃষ্টিতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আবর্জনা ও ব্যাধির কেন্দ্রস্থল। দেশীয় মহিলাদের ঔপনিবেশিক চিকিৎসার সাথে যুক্ত করার একটি উপায় ছিল প্রথাগত ধাই ব্যবস্থার সংস্কারসাধন। (৭) এই প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালে মেরি ফ্রান্সিস বিলিংটন লিখেছিলেন যে "The infant mortality is very high not on account of evil intent but is due to the apalling ignorance of the dhais whose method of treatment are barbarous and would be enough to kill every unfortunate victim upon whom they practised." (৮) Margaret Balfour এবং Ruth Young আরো বলেছেন যে পর্দানসীন রমণীগণ কখনই পুরুষ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাতেন না বা সন্তান জন্মের বিষয়ে পুরুষ সাহায্য তাদের কাছে কাঙ্খিত ছিলনা। (৯)

১৮৬০ সাল থেকে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা থেকে মহিলা মিশনারীরা ভারতে এসে হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ধাত্রী মহিলা ও আয়াদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। বলা যেতে পারে মিশনারী মহিলারা ভারতে আসার আগে সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রসবের বিষয়ে আগ্রহী ছিলনা। ১৮৫৭ সালের পরে মিশনারী মহিলাদের ভারতে আগমন বৃদ্ধি

পায়। অন্তঃপুরে মহিলারা প্রবেশ করতে পারতেন এবং তাঁরা প্রসূতির সময় ভারতীয় নারীদের দুর্দশা দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে আমেরিকার Methodist Episcopal Church এর Women's Foreign Missionary Society র সদস্যা মিস Clara Swain ভারতে আসেন। এক দশক পরে ইংল্যান্ডের Zenana Missionary Society মিস Fanny Butler কে ভারতে পাঠান । স্বল্প হলেও কিছু ভারতীয়দের প্রসূতিকালে চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে সফল হন। তাঁদের প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয় ভাইসরয়দের পত্নীদের প্রচেষ্টা। "Viceroy's wives seemed to feel obliged to raise funds to improve the position of women in India" (১০). Miss. Beilby ১৮৭৫ সালে মিশনারী কাজে লক্ষ্ণৌ আসেন। বুন্দেলখন্ডের একটি রাজ্য পুন্নার রাণীকে তিনি চিকিৎসা করেন। মহারাণী তাঁকে অনুরোধ করেন যে তিনি ইংল্যান্ডে প্রত্যাগমন করে ভারতীয় মহিলাদের অসুস্থতাজনিত কষ্টের কথা যেন মহারাণীকে অবহিত করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া জানান যে তিনি ভারতীয় মহিলাদের ক্লেশভোগ হ্রাস করার জন্য সকল প্রয়াসের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন। ১৮৮৩ সালে লেডি ডাফরিন ভারতে আসার সময় মহারাণী তাঁকে ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ভারতে আসার পর লেডি ডাফরিন অন্যান্য গভর্ণরের পত্নীদের এ বিষয়ে সমর্থন লাভের পর ১৮৮৫ সালে "The National Association for Supplying Female Medical Aid" or "Dufferin Fund" গঠন করেন ভারতীয় মহিলাদের জন্য। এই ফান্ডের উদ্দেশ্য ছিল ডাক্তারদের, হাসপাতালের সহকারীদের, নার্স ও ধাত্রীদের চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষাদান করা; চিকিৎসাকেন্দ্র, মহিলা বিভাগ, মহিলা চিকিৎসক, মহিলা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা এবং ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। (১১)

শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষগণও ভারতীয় মহিলাদের জন্য পুরনো ধাই ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও ধীরে ধীরে চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসা পরিষেবা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জেমস মিল একদা বলেছিলেন যে, যেই দেশের অর্ধেকাংশ অশিক্ষিত ও অবহেলিত, সেই দেশকে সভ্য বলা অযৌক্তিক। ভারতে হিন্দুদের দেখলে সেই ধারণা পরিস্কার হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষেরা এই দোষারোপ খন্ডন করা ও দেশের নারীর অবস্থার প্রতি সহানুভূতি থেকে নারীশিক্ষা ও ধীরে ধীরে নারীর স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠেন। শিক্ষিত অভিজাত ও ব্রাহ্মসমাজের অনেক পুরুষ সদস্যরা ধাত্রীবিদ্যার সুবিধা লাভে তৎপর হন। ব্রাহ্ম ম্যাগাজিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হত। শিশু মৃত্যু হার খুব অধিক হ্রাস না পেলেও ভদ্রমহিলারা প্রসূতির যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য নতুন ধাত্রীবিদ্যার সুবিধা লাভে তৎপর হন। ১৮৭০ সালে 'The Calcutta Medical College' এবং ঢাকাতে 'The Mitford Hospital' -এ ধাত্রীবিদ্যার পাঠ্যসূচী শুরু করা হয়। মহিলাদের আধুনিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে " মাতা ও শিশু যত্নের " ওপর সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা 'শিশু পালন' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। " Books on medical care, hygiene and simple midwifery written specially for women were printed ranging from 500 to 2000 copies and often went into many editions." (১২)

ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স দেওয়ার দাবী করা হলেও এই ব্যবস্থাটি বাস্তবায়িত করতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে মিশনারী প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হল এবং নতুন হসপিটালগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমান ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতে অসফল ছিল। প্রথম দিকে ধাইদের শিশুজন্মের পাশ্চাত্য পদ্ধতির সাথে পরিচিত করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু প্রথাগত ধাইরা এর বিরোধিতা করে কারণ হাসপাতালে গিয়ে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তারা টাকা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাছাড়া পাশ্চাত্য উপায়ে প্রসূতিকে তারা তাদের কার্যপদ্ধতির বিরোধী বলে মনে করে। অনেকে ধাত্রীবিদ্যা পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলনা। ফলে ডাফরিন ফান্ড " decided to create a class of nurses and midwives who would in time supplant the dhais, or by successfully competing with them, force them to seek instructions offered to them." এই প্রসঙ্গে বালফোর বলেছেন যে ধাইরা তাদের কাজ ও জনপ্রিয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় প্রশিক্ষণ নিতে অরাজী ছিল এবং ভারতীয় মহিলাদের মন তারা ইউরোপীয় ধাত্রীবিদ্যার সম্পর্কে অবিশ্বাস ও ভুল কথা দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করত। (১৩)

১৮৩৭ সালে পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ দ্বারা একটি ধাত্রীবিদ্যার কর্মসূচীর সমর্থনের কথা সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী কলকাতা মেডিকেল কলেজ ১৮৪০ সালে ধাত্রীবিদ্যার হাসপাতাল শুরু করে। হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৮৪৮ সালে Midwifery Hospital এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তাদের স্নাতক ছাত্ররা 'অভিজাত নেটিভ'দের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন কারণ শিক্ষিত ভারতীয়রা তাদের মহিলা ও শিশুদের আর অবহেলায় ফেলে রাখতে ইচ্ছুক নয়। ঢাকার Mitford Hospital, Eden Hospital, অমৃতসরে Church of England Zenana Missionary Society-র তত্ত্বাবধানে প্রচলিত Amritsar Dais' School-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার তুলনায় মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ বেশি সফল হয়েছিল। প্রশিক্ষণে প্রাত্যহিক উপস্থিতি সম্ভব না হওয়ায় ও ইংরেজী না জানার ফলে পেশাদারী ধাইরা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা লাভ থেকে বিরত থাকত। পরিবর্তে এই পাঠ্যক্রমে প্রধানতঃ ভারতীয় খ্রীস্টান, ইউরেশিয়ান ও কিছু ইউরোপীয় এবং কখনো হিন্দু, মুসলমান বা ব্রাহ্ম মহিলাগণ ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণ লাভে এগিয়ে আসেন।[১৪]

কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষালাভ কতগুলি সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিল। এই কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত ছাত্রী পাওয়া মুশকিল ছিল। দেশীয় ধাইরা ক্লাসে নাম নথিভুক্ত করলেও তাদের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত করা সহজ ছিলনা। বৃত্তি প্রদান বা ঘুষের লোভ দেখিয়েও তাদের শিক্ষা দেওয়া দুষ্কর ছিল; অনেক ক্ষেত্রে তারা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার উৎকৃষ্টতা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ডাক্তারেরাও তাদের সাথে সহযোগিতা করতে তৈরী ছিলেন না। ১৯০১ সালে লেডি কার্জন জেনানা মহলে পরিষেবা দেওয়ার জন্য ধাইদের পুণরায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে Victoria Memorial Scholarship Fund এর ব্যবস্থা করেন। কিছু ধাত্রী সরকারী হাসপাতালে Matron পেশায় যুক্ত হয়। উনিশ শতকের শেষে বেশিরভাগ শিক্ষিত ভারতীয় পরিবার ডাক্তারদের সাহায্যে প্রসূতির ব্যবস্থা করে। ধাত্রীরা পুরুষ ডাক্তারদের সন্তান প্রসবে সাহায্য করলেও পুরুষ ডাক্তারই সফল প্রসূতির জন্য প্রশংসা ও সম্মান লাভ করতেন। সাধারণ পরিবার প্রথাগত ধাইদের দ্বারাই প্রসূতির কাজ সম্পন্ন করত। পুরনো প্রসূতি পদ্ধতির সমালোচনা করা হলেও প্রথাগত ধাইদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াসের অভাব দেখা যায়। ব্রাহ্মরা সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ধাত্রীদের প্রয়োজনের কথা বললেও ভারতীয় সকল শিক্ষিত সম্প্রদায় একই অভিমত পোষন করেনি। অনেক শিক্ষিত পরিবারে অন্তঃপুরের ইচ্ছানুযায়ী চিরাচরিত উপায়ে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হত। অন্যেরা দুটি ব্যবস্থা একত্রিত করে পুরুষ চিকিৎসকদেরকেই সূতিকাগৃহে আহ্বান জানাত।[১৫] কিন্তু ধীরে ধীরে শহর ও জেলা সরকারী হাসপাতালে এবং চিকিৎসালয়ে ধাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা ও 'বিপদজনক ধাই' দের শিশু ও মাতৃমৃত্যুর জন্য দায়ী করার ফলে আধুনিক ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষার জন্য নতুন নতুন প্রকল্পের প্রস্তাবনা করা হয়েছিল। ধাত্রীরাই ধাইদের বিকল্প হিসেবে প্রসূতির ক্ষেত্রে স্থান তৈরী করে নিয়েছিল।

১৮৫৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রাণীবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ব্যবহারিক ঔষধবিজ্ঞান, ধাত্রীবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্য চিকিৎসা প্রভৃতি পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হত — প্রাথমিক শ্রেণী, শিক্ষানবিস শ্রেণী, হিন্দুস্থানী শ্রেণী ও বাঙালী শ্রেণী। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজীর পাঁচ বছরের পাঠক্রম পূরণের পর 'Licence in Medicine and Surgery (LMS)', 'The Bachelor of Medicine (MB),' এবং The 'Doctorate of Medicine (MD)' পরীক্ষার জন্য বসার যোগ্য বলে মনে করা হত।[১৬] বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ ও আগ্রা প্রভৃতি শহরে চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মহিলারা শিক্ষা লাভ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হলেও চিকিৎসা বিদ্যায় মহিলাদের প্রবেশ ঘটেছে বহু পরে। সাধারণ শিক্ষার বা General Education এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল পেশাদারি শিক্ষা বা Professional Education[১৭]। Profession বা পেশাদারিত্ব কথাটির অর্থ হল " an occupation exhibiting professional attributes such as autonomy in

terms of situation, a community oriented code of ethics and the period of training and higher prestige and status associated with it. "[১৮] । মহিলারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হলে সেটা তাদের সম্মানের উন্নতির পরিচায়ক। মহিলাদের জীবন ও সম্মানের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা domestic এবং public শব্দ দুটির ব্যবহার করে থাকেন। কারো মতে দুটি জগৎ পুরোপুরি ভিন্ন। আবার কেউ কেউ মনে করেন দুটি জগৎ পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মহিলারা চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করা হয়। " A number of bhadramahila were beginning to face the problem of finding ways to lessen the total dependence on men that left women helpless if they fell on hard times."[১৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহিলা চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় সকলে একমত ছিল না। একটি রক্ষণশীল পত্রিকায় বলা হয় যে, মহিলা চিকিৎসকদের অভাবে মহিলারা অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছে না। মহিলাদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সম্ভব ছিল না যদি চিকিৎসার অভাবে মহিলাদের মৃত্যু ঘটত। অপরদিকে মহিলা চিকিৎসকদের দাবীতে লেখা হয় যে, " we know of several instances in orthodox hindu families, where the female members suffer from most complicated diseases, but yet would not allow male doctors to visit and treat them. The consequence is they are treated second hand through the assistance of uneducated quack native midwives and in ninety nine cases out of hundred, they are never radically cured."[২০] ইংল্যান্ডে ১৮৭৭ সাল থেকে মহিলারা চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করতে পারতেন। বাংলায় নীচু জাতির মহিলারা ধাই এবং কোন কোন মহিলা কবিরাজী হতে পারতেন কিন্তু মহিলাদের চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভের বিষয় নিয়ে আপত্তি ছিল। বাংলায় মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার সময় 'স্ত্রীলোক কেন ডাক্তারি পড়বে না' এবং 'কেন পড়বে', এ প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। 'স্ত্রীলোক কেন ডাক্তারি পড়বে না' — এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে ডাক্তারি পড়তে হলে ছাত্রদের রাত্রিবাস করতে হয় একঘরে কিন্তু স্ত্রীলোক কীভাবে পুরুষের সাথে একসাথে থাকবে; পুরুষ শিক্ষক ছাত্রীদের কীভাবে বোঝাবে; ছাত্র-ছাত্রী একসাথে কীভাবে শিক্ষালাভ করবে প্রভৃতি। অপরদিকে 'স্ত্রীলোক কেন ডাক্তারি পড়বে' — এ বিষয়ে বলা হয় যে স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসকই প্রয়োজনীয়। যেখানে মহিলাকুল পর্দার অন্তরালে বহিরাগত পুরুষের থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে, সেখানে মহিলা চিকিৎসক বেশি দরকারী। স্ত্রী চিকিৎসক দ্বারা ব্যাধির নিবারণ হলে পারিবারিক চিকিৎসা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হতে পারবে এবং স্ত্রীলোকের অর্থোপার্জনের প্রকৃষ্ট পথ তৈরী হবে।[২১] গভর্নমেন্ট নারীদের ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা করেছে, অতএব সেই সুযোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

সময়ের সাথে সাথে ইংল্যান্ড এবং ভারতীয় জনমত উপলব্ধি করেছিল যে, ভারতীয় রমণীদের জন্য মহিলা চিকিৎসক প্রয়োজনীয়। ব্রিটিশ মহিলা ডাক্তার Frances Hoggan মতামত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় চিকিৎসা পরিষেবা বা Indian Medical Service ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং মহিলা চিকিৎসকরাই তাদের রোগিনীদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। ঔপনিবেশিক সরকার চিরাচরিত ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় মহিলা চিকিৎসকদের পরিষেবা ব্যবহারে অসফল হয়েছে যদিও অনেক ভারতীয় মহিলা তাদের ওপর চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল ছিল।[২২] ডাঃ হোগ্গানের মতে ভারতীয় নারীদের পুরুষ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা না করানোকে কুসংস্কার হিসেবে দেখা অনুচিত। তার এই চিন্তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। তাই সরকার দু ধরণের মহিলা চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিক — একদল দেশের সাধারণ মহিলাদের চিকিৎসা করবে এবং বেশি অভিজাত মহিলা চিকিৎসকরা বড় বড় শহরে শিক্ষা প্রদান ও চিকিৎসা চর্চ্চা করবে। George A. Kittiredge নামে বোম্বাইতে অবস্থানরত এক আমেরিকান ব্যবসায়ী ডাক্তার হোগ্গানের আবেদনে প্রভাবিত হন। 'Medical Women's Fund' মহিলাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের জন্য তৈরী করা হয়। তিনি তাঁর পার্সি বন্ধুর সাহায্য লাভ করেন এবং Pestonji Hormusji Cama নারী ও শিশুদের হাসপাতাল নির্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৮৬ সালে 'Cama Hospital' শুরু হয়।

ডাফরিন ফান্ডের লক্ষ্য ছিল " to bring medical knowledge and medical relief to the women of India by providing women medical workers ." কার্য বিবরণীতে বলা হয় যে এই ফান্ডের মাধ্যমে মহিলাদের চিকিৎসক এবং ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিত করা হবে, মহিলাদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় খোলা হবে, ভারতীয় মহিলাদের যন্ত্রণার লাঘব করা হবে এবং মহিলা রোগী ও শিশুদের যত্ন শুশ্রূষার জন্য ধাত্রী ও আয়ার ব্যবস্থা করা হবে। (২৩) ভিক্টোরিয়া ছিলেন এই ফান্ডের পৃষ্ঠপোষক এবং ভারতে এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভাইসরয় ডাফরিন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় অভিজাতগণ এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তাঁরাও মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র গঠনে অর্থ প্রদান করেছিলেন। বাংলায় রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর বা মতিলাল শীলের মত ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা আধুনিকতারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশদের দ্বারা আরোপিত ভারতীয় পুরুষদের মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতার অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য মহিলাদের শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। "There was also an urge to create a compatriot wife who would bring about discipline, order and hygienic practices in middle class home ". (২৪) ১৮৮৩ সালে Brahmo Public Opinion এ বলা হল যে, ভারতে মহিলা চিকিৎসকের আবশ্যকতা, পরিস্কারভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। পর্দা ব্যবস্থার ফলে অনেক মহিলা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছে। বামাবোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে পুরুষদের মত নারীদেরও চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যিক। মহিলা রোগ পুরুষ চিকিৎসক নয়, একমাত্র মহিলা চিকিৎসকেরাই বুঝতে পারবেন ও চিকিৎসা করতে পারবেন।

কোন ডিগ্রি ছাড়া ১৮৭০ সালের পূর্বে কিছু মিশনারী মহিলা ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চ্চা করতেন। Dr. Clara Swain এবং Dr. Fanny Butler ছিলেন ডাক্তারি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ ভারতের প্রথম মিশনারী মহিলা চিকিৎসক। ভারতে বিদেশী মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ নারীদের জন্য ইংল্যান্ডের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। দেশে চিকিৎসা চর্চার সুযোগ না লাভ করলেও ভারতের মাটিতে বিদেশী মহিলা চিকিৎসকগণ সেই সুযোগ লাভ করেন। ব্রিটিশ সরকার এই মহিলাদের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকারের মানবিক মুখ এবং ভারতীয় নারীদের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। (২৫) ভারতে কলকাতা মেডিকেল কলেজের আগেই মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে মেয়েরা চিকিৎসাবিদ্যা লাভের অনুমতি পায়। অবলা দাস ও এলেন দাব্রুর মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন যেখান থেকে তারা সার্টিফিকেট ডিগ্রি লাভ করেন। (২৬) মেডিকেল কলেজের কাউন্সিল এবং মেডিকেল বিজ্ঞানের শাখা মেয়েদের চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের বিরোধিতা করে। নারীদের তারা নার্স ও ধাত্রী হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। মহিলাদের জন্য মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তারা মনে করতেন। তাদের মতানুযায়ী যে সকল মহিলা প্রশিক্ষণ নিতে আসবে তারা পুরো শিক্ষা সমাপ্ত করতে না পেরে অর্ধশিক্ষিত হবে এবং চিকিৎসাবিদ্যাকে কলঙ্কিত করবে। সরকারকে মহিলা চিকিৎসক তৈরী করতে হলে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু অনেক ভারতীয় পুরুষ এই মতের বিরোধিতা করে জানান যে তাদের পরিবারের জন্য মহিলা চিকিৎসক আবশ্যক এবং তাদের কন্যারা চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষালাভে আগ্রহী। তারা সরকারের সাথে একজোট হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বার নারীদের জন্য উন্মুক্ত করতে চান।

মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়বার জন্য স্নাতক হওয়া আবশ্যিক ছিল। নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তি বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিনা বেতনে মেডিকেল কলেজে পড়তে পারবেন। যে কোন ব্যক্তি (এনি পারসন) পুরুষ বা নারী উভয়কেই ইঙ্গিত করে। ফলে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে এই নিয়মের সুযোগে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি Bachelor of Medicine ডিগ্রির বদলে Graduate of Bengal Medical College উপাধি লাভ করেন। ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার ছিলেন মহারাষ্ট্রের আনন্দীবাই জোশী। ১৮৯০ সালে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৫ সালের মধ্যে চৌত্রিশজন মহিলা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এদের মধ্যে

একুশজন মহিলাকে ডাফরিন হাসপাতালগুলিতে চাকরি প্রদান করা হয়। কিন্তু অনেক সময় চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলি দেশীয় মহিলা ডাক্তারদের প্রতি শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করত। ডাফরিন ফান্ড ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান চিকিৎসকদের বেশি অগ্রাধিকার দিত। কাদম্বিনী এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন যে —" Hospitals exist for two purposes -- the treatment of the sick, poor and the education of the medical profession and that the performance of the hospital duties quietly improved the qualifications of a doctor. The Indian medical women will miss all the advantages of such professional duties by their exclusion from the medical charge of important hospitals or by being placed in an inferior position, for in the inferior class of hospitals, few cases of importances will ever come for treatment. No opportunity has yet been offered to Indian medical women to show whether they are capable of taking the responsible change of large and important hospitals." (২৭)

ডাফ হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি জেলায় শুরু হলে মহিলাদের হাসপাতালে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সেজন্য তাদের কম বেতন গ্রহণ করতে হবে। তা সত্ত্বেও অনেক মহিলা স্নাতক এই চাকরিতে যোগদান করেন। " Clearly Indian women continued to be disadvantaged in a system that placed men above women, foreign credentials above those earned in India." অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয় যখন ১৯০৭ সালে The Association of Medical Women in India নারীদের চিকিৎসা পরিষেবা বা Women's Medical Service এর জন্য তৎপর হয়। ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার থেকে ইংরেজীকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হত। জেরাল্ডিন ফর্বস এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে মেডিকেল কলেজে মহিলাদের প্রবেশের ব্যবস্থা করে সরকার নারীদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য জাতি বা race এর তুলনায় স্ত্রীদের অধিক গুরুত্ব দিয়েছে , কিন্তু চিকিৎসা পাঠক্রম ভারতীয় মহিলাদের তুলনায় ইউরোপীয় মহিলাদের কাছে বেশি সুবিধাজনক ছিল।

মহিলাদের চিকিৎসাক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনের তৃতীয় উপায়টি ছিল তাদের হাসপাতালের সহকারী বা Hospital Assistants হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৮৭০ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে নীলকমল মিত্রের নাতনী বিরাজ মোহিনীকে ভর্তি করানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রীকে পৃথক ঘরে পড়ানোর আবেদন নাকচ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮০ র দশকে তিনটি প্রেসিডেন্সির মেডিকেল কলেজের দ্বার মহিলা ছাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। যে সকল মহিলা পর্দা প্রথার জন্য এতদিন চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারত না, তাদেরকে চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে সুবিধা দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল। (২৮) ১৮৬৭ সালে বাংলায় ৬১ টি চিকিৎসালয় খোলা হয়েছিল যা ১৯০০ সালে বেড়ে ৫০০ হয়। ১৮৮৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের অন্তর ও বহিঃবিভাগে ৪১,২১৭ জন মহিলাকে চিকিৎসা করা হয় যা ১৮৯৯ সালে ৪৪,৩৭০ য়ে গিয়ে পৌঁছয়। যদিও মেডিকেল কর্তৃপক্ষ নারীদের মেডিকেল কলেজে প্রবেশের বিরোধিতা করে, তা সত্ত্বেও শিক্ষিত ভারতীয় গোষ্ঠী Campbell Medical কলেজের তত্ত্বাবধায়ককে মহিলা হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে সফল হন। Director of Public Instruction এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে ছাত্রীদের হাসপাতালে প্রবেশ থেকে শুরু করে বৃত্তি প্রাপ্তিরও ব্যবস্থা করেন। Campbell Medical College য়ে ১৮৮৮ সালে পনেরো জন মহিলাকে হাসপাতাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি নেয়। এই ক্লাসে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান ও ইউরেসিয়ান মহিলারা প্রবেশ করেন। The Indian Messenger জানায় যে নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে এই পেশায় যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু মহিলাদের বেশিরভাগ ইংরেজী ভাষার সাথে অবগত না থাকায় সফল হতে পারতেন না। সরকার এই শিক্ষার মান আরো উন্নত করায় হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা খ্রীস্টান ও ইউরেসিয়ান মহিলাদের থেকে শিক্ষালাভে পিছিয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে এইসকল দেশীয় মহিলা হাসপাতাল সহায়িকারাই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যাকে বাংলার জেলাগুলিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। "They became the backbone of these small hospitals and dispensaries, staffing almost 90 percent of those set up by the Dufferin Fund as well as a

number of Government Institutions ". [২৯] . তাদের ডিগ্রি নিম্নতর হলেও হাসপাতালগুলিতে তাদের নিয়োগ করা হত। মেয়েদের হাসপাতালে চাকরি করা ছিল সম্মানীয় এবং আর্থিক দিক থেকে তারা নিজেদের স্বয়ং নির্ভরশীল করতে সফল হয়েছিলেন। বেতন কম হলেও ব্যক্তিগতভাবে তারা চিকিৎসা করতে পারতেন জেলা হাসপাতালে ও চিকিৎসালয়ে। ঊনবিংশ শতকের শেষে বাংলার বিভিন্ন মহিলা হাসপাতালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা চিকিৎসকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। সকলে কলকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা বিদ্যার স্নাতক না হলেও ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজ ও আগ্রা মেডিকেল কলেজ থেকে হাসপাতাল অ্যাসিস্ট্যান্টয়ের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ব্রিটিশ মহিলা চিকিৎসকরা জেলায় বা শহরতলিতে গিয়ে চিকিৎসা চর্চা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ফলে ভারতীয় মহিলা হাসপাতাল সহায়িকারাই এই সব অঞ্চলে মহিলাদের চিকিৎসার প্রয়োজন পূর্ণ করতেন। হৈমবতী সেন, হেমাঙ্গিনী দেবী, মেনকা দেবী, নিস্তারিণী চক্রবর্তী, প্রিয়বালা গুহ 'Vernacular Licentiate in Medicine and Surgery' (VLMS) ডিগ্রি লাভ করে হুগলিতে, বাকুড়ার ডাফরিন মেডিকেল হাসপাতালে, মুর্শিদাবাদের গিরিশচন্দ্র হাসপাতালে, শাহাবাদের ডুমরাও রাজ হাসপাতালে, বোগরার জুহারুণন্নিসা মহিলা হাসপাতালে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধেয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁদের পরিষেবার ফলে শহরাঞ্চলের অনেক সাধারণ দেশীয় নারীরা গৃহে অথবা ডিসপেনসারিতে গিয়ে পাশ্চাত্য ঔষধের সুবিধা লাভ করতে পারত।

কিন্তু মহিলা চিকিৎসকদের অনেক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হত। মফস্বলে মহিলা চিকিৎসকরা একা থাকার জন্য অনেক সময় নিন্দিত হতেন। They had to be constantly on guard against attacks on their reputation as well as occasional physical assault. They were often subjected to hostile and derisive reaction from the local male population. [৩০] মহিলা ডাক্তারদের যৌন নিগ্রহেরও শিকার হতে হত বা তাদের ধর্ষণের ভয় দেখানো হত। সরকারী বৈষম্যমূলক নীতির ফলে অনেক মহিলা চিকিৎসক নৈরাশ্যের শিকার হন। দেশীয় সংবাদপত্রে অভিযোগ করা হয় যে, সরকারী রাজস্বের অনেকাংশ ইউরোপীয় মহিলা ডাক্তারদের হাসপাতালে নিয়োগ করে বেতন দিতে খরচ হচ্ছে যদিও এইজন্য শিক্ষিত দেশীয় মহিলা চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয় ডাক্তারদের পারিশ্রমিকের সমান পারিশ্রমিক দাবী করায় অনেক পরিবার মহিলা চিকিৎসকদের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। লেডি ডাফরিন ফান্ডের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন পদগুলি ইউরোপীয় মহিলা চিকিৎসকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মহিলা মিশনারী চিকিৎসকেরা ঔপনিবেশিক সরকারের এই বৈষম্যের সুযোগ নিয়ে সমস্ত প্রাপ্য পদগুলি নিজ দখলে রাখেন ও ভারতীয় মহিলাদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। ফলে ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের লিঙ্গ ও জাতিগত বৈষম্য, উভয়েরই শিকার হতে হয়। বড় বড় হাসপাতালে পুরুষ চিকিৎসকেরাই অধিকতর অস্ত্র চিকিৎসা করতেন কারণ তারা মনে করতেন যে মহিলা চিকিৎসকেরা জটিল অস্ত্র চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে যোগ্য নন যদিও অনেক ব্যক্তির গৃহে তারা রোগিনীর শরীরে অস্ত্রপচার করতেন। চিকিৎসা পেশায় পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে মহিলাদের ঔষধ সম্বন্ধে বোঝার ক্ষমতা কম। মহিলা ডাক্তারেরা কৃতিত্বের সাথে ভালো নম্বর লাভ এবং পুরুষ চিকিৎসকের মত সমসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তারা হাসপাতালে বেশি রোগীর চিকিৎসা করে না বলে সমালোচিত হতেন। মহিলা চিকিৎসকদের হাসপাতাল সহকারী হিসেবে দেখা হত। ১৯০৩ সালে পুরুষ চিকিৎসকেরা মহিলাদের হাসপাতালে ডাক্তারিতে ভর্তির মান আরো বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

তবুও মহিলাদের চিকিৎসাবিদ্যা লাভ মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহিলা হাসপাতাল এবং ব্যক্তিগতভাবে গৃহে গিয়ে নারীদের চিকিৎসা করে তারা ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসার প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। নারী অগ্রগতির ক্ষেত্রে মহিলাদের চিকিৎসা জগতে প্রবেশ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হয়। বহির্জগতে পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে তারা কাজ করেন এবং স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করেন। প্রচুর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য মহিলা চিকিৎসকের ব্যবস্থা, মহিলাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষালাভ ও চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ছিল উনিশ শতকে নারী প্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

সূত্র - নির্দেশ

১) গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, *স্পন্দিত অন্তর্লোক : আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা, (কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯), পৃঃ ১৬*

২) শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *ভারতের নারী, (কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮১), পৃঃ ৫০*

৩) Mary Frances Billington, *Women in India, (New Delhi, 1973), p.2-3*

৪) Kenneth Ballhatchet, *Race,Sex and Class under the Raj ; Imperial Activities and Policies and their Critics, 1793 -- 1905, (London, Weidenfeld and Nicolson, 1980), p.11*

৫) David Arnold, Colonizing the Body : *State Medicine and Epidemic Diseases in Nineteenth Century India (Delhi, Oxford University Press, 1993), p.292*

৬) M. Balfour and Ruth Young, *The work of Medical Women in India, (London, Oxford University Press, 1929), p.13 - 14*

৭) David Arnold, *op.cit. p.255*

৮) Mary Frances Billington, *op.cit. p.36*

৯) M. Balfour, *op.cit. p.34*

১০) Roger Jeffery, *The Politics of Health in India, (London, University of California Press Ltd,1988), p.89*

১১) Geraldine Forbes, *Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography (New Delhi, Chronicle Books, 2005), p.86*

১২) Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849 -- 1905, (Princeton, Princeton University Press, 1984), p.159*

১৩) M. Balfour, *op. cit. p.20*

১৪) Geraldine Forbes, *op. cit. p.106*

১৫) Dagmar Engels, *Beyond the Purdah ? Women in Bengal, 1890 -- 1939, (Delhi, Oxford University Press, 1996)*

১৬) Deepak Kumar, *Science and the Raj: A Study of British India,* *(New Delhi, Oxford University Press, 1995), p.33*

১৭) Sankar Sen Gupta, *A Study of Women of Bengal, (Calcutta, Indian Publications, 1970), p.253*

১৮) Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio Historical Perspective,* *(New Delhi, Sage Publications, 1991), p.65*

১৯) Meredith Borthwick, *op.cit.310*

২০) Female Doctors in Bengal,Brahmo Public Opinon, 27 June, 1878, Cited in M.Borthwick, *op.cit.p321.*

২১) সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালজয়ী কাদম্বিনী ও তাঁর কাল, (কলকাতা, ডলফিন, ২০১২), পৃ: ৬৪*

২২) Sujata Mukherjee, Disciplining the Body ? Health Care for Women and Children in Early Twentieth Century Bengal in Deepak Kumar (ed), *Disease and Medicine in India, A Historical Overview, (New Delhi, Tulika Books, 2001), p.199.*

২৩) Sujata Mukherjee, Imperialism, Medicine and Women's Health in Nineteenth Century India, in Arun Bandopadhyay (ed), *Science and Society in India, 1750-2000, (New Delhi, Monohar, 2010), p.107*

২৪) *Ibid, p.111*

২৫) Geraldine Forbes, *op.cit.p.110*

২৬) সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত, পৃ:৯২*

২৭) *তদেব, পৃ:৮৫*

২৮) Mark Harrison, *Public Health in British India: Anglo Indian Preventive Medicine, 1859-1914,* *(New Delhi, 1994), p.89*

২৯) Geraldine Forbes, *op.cit.p.116*

৩০) Meredith Borthwick, *op.cit.p.324*